উমার দয়া হরিশ্চ বলিরাজার দান নচিকেতার ক
শিবিরাজার দান সীতার দয়া ক দান বন্ধুর কথা পশুর দয়া স
দয়া মৈত্রেয়ীর কথা উমার দয়া হরিশ্চন্দ্রের দান নচিকেতার কথা পাখি

কথা

উমার দয়া হরিশ্চন্দ্রের দান পাখির দয়া বলিরাজার দান নচিকেতার ক
শিবিরাজার দান সীতার দয়া কর্ণের দান বন্ধুর কথা পশুর দয়া সখা
কথা মৈত্রেয়ীর কথা উমার দয়া হরিশ্চন্দ্রের দান নচিকেতার কথা পাখি

যুগে

উমার দয়া হরিশ্চন্দ্রের দান পাখির দয়া বলিরাজার দান নচিকেতার ক
শিবিরাজার দান সীতার দয়া কর্ণের দান বন্ধুর কথা পশুর দয়া সখা
কথা মৈত্রেয়ীর কথা উমার দয়া হরিশ্চন্দ্রের দান নচিকেতার কথা পাখি

যুগে

উমার দয়া হরিশ্চন্দ্রের দান পাখির দয়া বলিরাজার দান নচিকেতার ক
শিবিরাজার দান সীতার দয়া কর্ণের দান বন্ধুর কথা পশুর দয়া সখা
কথা মৈত্রেয়ীর কথা উমার দয়া হরিশ্চন্দ্রের দান নচিকেতার কথা পাখি

বিষ্ণুপদ পাণ্ডা

উমার দয়া হরিশ্চন্দ্রের দান পাখির দয়া বলিরাজার দান নচিকেতার ক
শিবিরাজার দান সীতার দয়া কর্ণের দান বন্ধুর কথা পশুর দয়া সখা
কথা মৈত্রেয়ীর কথা উমার দয়া হরিশ্চন্দ্রের দান নচিকেতার কথা পাখি

কথা যুগে যুগে

প্রথম ভাগ

বিষ্ণুপদ পাণ্ডা

প্রাপ্তিস্থান

অমর ভারতী ✱ ৮সি, ট্যামার লেন, কলি-৯

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৭৭

মূল্য : ৫·০০ টাকা

প্রকাশক ঃ
এম, পাল
বেলেঘাটা
কলিকাতা-৭০০০১০

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীরামগোপাল মাইতি
লক্ষ্মী প্রেস
১৫ সি, পঞ্চানন ঘোষ লেন কলিকাতা-৭০০০০৯

কাহিনী সূচী

উমার দয়া

হিমালয়ের আর এক নাম গিরীশ। তাঁর স্ত্রী মেনকা। বাবা হিমালয় আর মা মেনকা। এঁদের মেয়ে উমা। একটিই মেয়ে। বোধহয় সেইজন্যই বড় আদরের মেয়ে উমা! এই আদরের দুলালীর সঙ্গে বিয়ে হোল শিবের। শিবকেই পেতে চেয়েছিলেন উমা। তাঁরই পুজো করেছেন ছেলেবেলা থেকে। শিবকেই ভেবেছেন নিজের জীবন-দেবতা রূপে। তাঁর মনের সাধ মিটল। তিনি সুখী হলেন। সুখী হলেন বাবা হিমালয় আর মা মেনকা।

শিবের আর এক নাম ভোলানাথ। তিনি আপনভোলা দেবতা। বেলপাতা দিয়ে পুজো করলে বড় খুশী হন। তখন যেকোন বর চাইলেই হোল! ভোলানাথ খুশীমনেই বর দেন তখন। ভোলানাথের এমন ভোলা মন যে, উমার কথাও ভুলে যান। সাধনায় যখন বসেন তখন ত কিছুই মনে থাকেনা। আবার কৈলাস থেকে চলে যান উমাকে ছেড়ে কখনো কখনো। উমা তখন বসে কেবল ভাবেন আর ভাবেন। ভোলানাথকে নিয়ে তাঁর ভাবনার শেষ নেই যেন।

এমনি একদিনের ঘটনা। ভোলানাথ কোথায় যেন চলে গিয়েছেন। উমার মন ভীষণ খারাপ। বসে ভাবছেন তাঁরই কথা। কী জানি কোথায় গিয়েছেন! কবে ফিরবেন তাই বা কে জানে! হঠাৎ যেন ছোট ছেলের কান্না শুনতে পেলেন উমা। কাতর হয়ে ছেলেটি কাঁদছে আর বলছে, 'আমাকে কুমীরে ধরেছে। তোমরা

কে কোথায় আছ, আমাকে বাঁচাও। আমি বাবা-মা'র একই ছেলে। যে করে হোক আমাকে বাঁচাও।'

কাছেই একটা বড় ঝিল। ওখান থেকেই ভেসে আসছিল কান্না। উমা তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলেন। গিয়ে দেখেন, ঝিলের জলে একটি কুমীর। কুমীরটি মুখে ধরে রেখেছে সুন্দর একটি ছেলেকে। সেই ছেলেটিই কাঁদছে। কাতর হয়ে ডাকছে সবাইকে তাকে বাঁচানোর জন্য। এদিকে উমাকে আসতে দেখে কুমীর সরে গেল। ঝিলটির একেবারে মাঝখানে চলে গেল সে। তখনো তার মুখের মধ্যে ছেলেটি কেঁদেই চলেছে।

উমার মনে ভীষণ কষ্ট হোল। ছেলেটির দুঃখ তিনি সইতে পারলেন না। কুমীরকে ডেকে বললেন, 'তুমি দয়া করে ছেলেটিকে ছেড়ে দাও। তুমি যদি ওকে দয়া কর, তোমার ভালো হবে। আমার কথা রাখো, ওকে তুমি বাঁচতে দাও।'

কুমীর বললে, 'তা কী করে হয়? সারাদিন আমি খেতে পাইনি। এতক্ষণে খাবার জোগাড় করেছি। একে ছেড়ে দিলে না খেয়েই আমাকে থাকতে হবে। তাতে কী করে আমার ভালো হবে! ভগবান আমার খাবার জুটিয়ে দিয়েছেন—একে আমি ছেড়ে দিতেই পারিনে।

উমার দু'চোখ বেয়ে তখন জলের ধারা নেমেছে। ছেলেটির দুঃখে তাঁর বুক যেন ফেটে যাচ্ছে। তিনি হাতজোড় করে বললেন, 'তুমি আর আর কী খেতে চাও বল? যা চাইবে তাই তোমাকে আমি এনে দোব। আর শুধু খাবার জিনিসই বা বলি কেন, তুমি যা চাইবে তোমাকে আমি তাই দোব। তুমি দয়া করে ছেলেটিকে ফিরিয়ে দাও।'

কুমীর বললে, 'দেবী, আপনি অনেক পুণ্য করেছেন। সেসব ত আমার কিছুই নেই। আমার যা আছে তা হোল শুধু পাপ। আপনার কিছু পুণ্য আমাকে দিন। আমি ছেলেটিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি।'

উমা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'কিছু কেন, আমার সবটুকু পুণ্যই আমি দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। এবার তুমি দয়া করে ছেলেটিকে ছেড়ে দাও।'

কুমীরটি তখন চলে এলো উমার কাছে। তাঁর কাছে ছেলেটিকে নামিয়ে দিয়ে বললে, 'দেবী, আপনার দয়ার তুলনা নেই। এ ছেলেটি আপনার কেউ নয়। তবু তার জন্য আপনি যা করলেন, তা আর কেউ করবে না। আপনার পুণ্যে আমার কোন দরকার নেই। তার সবটুকুই আপনি ফিরিয়ে নিন। কত জপতপ করে পুণ্য জমিয়ে তুলেছেন আপনি। আপনার পুণ্য আপনারই থাক।'

উমা বললেন, 'তা কী করে হয়? যা দিয়েছি তা ফিরিয়ে নিই কী করে? তাছাড়া আবার নতুন করে আমি জপতপ করব। তখন আমার অনেক পুণ্য হবে। ছেলেটির প্রাণ গেলে তার বাবা-মায়ের ভীষণ কষ্ট হোত। তুমি আমার সবটুকু পুণ্যই নিয়ে নাও।'

কুমীর চলে গেল ঝিলের জলের মধ্যে। উমা আবার জপ-তপে বসবার আয়োজন করতে লাগলেন। তিনি তাঁর সবটুকু পুণ্যই দান করে দিয়েছেন। এবার আবার নতুন করে তা জমিয়ে তুলতে হবে। জপে বসতে যাবেন, এমন সময় ভোলানাথ এসে হাজির। হেসে বললেন, 'জপে বসতে হবে না তোমাকে উমা। তুমি ওঠ। ঐ কুমীর আর ছেলে সবই আমি। আমিই দেখছিলাম তুমি কত দয়ালু। আমাকে দান করে তোমার পুণ্য অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। তোমার দয়ার সত্যিই তুলনা নেই। তুমি ধন্য।'

সীতার দয়া

সীতাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন রাবণ। তাই নিয়ে রাম আর রাবণের বিবাদ। সে বিবাদে শেষ পর্যন্ত রাবণ মারা পড়লেন। মারা পড়লেন লঙ্কার বড় বড় বীরেরা। বিভীষণ রাবণের ছোট ভাই হলেও বড় ভালো মানুষ। তিনি দাদাকে অনেক করে বলেছিলেন সীতাকে ফিরিয়ে দিতে। রাবণ সে কথা শোনেননি। তিনি উলটে অপমান করলেন। বিভীষণ খুব দুঃখ পেলেন। তিনি চলে গেলেন রামের কাছে। রাম আর রাবণের বিবাদে তিনি রইলেন রামের দিকে।

রাবণ এমনিতে খুব বড় বীর ছিলেন। তাছাড়া নিজের দলেও খুব বড় বড় বীর ছিলেন। তাঁর ছেলে, ভাই সবাই ছিলেন নাম করা বীর। রাবণ শিবের পুজো করতেন। রাবণের সঙ্গে লড়াই করে জেতা তাই সহজ ছিল না। দেবতারা সবাই রামের পাশে না দাঁড়ালে কী হোত বলা কঠিন। যাই হোক, রাবণ শেষ পর্যন্ত হেরেছিলেন রামের জন্য। রাবণের জন্য শোক করলেন সবাই।

লঙ্কার যুদ্ধ শেষ হোল। মাতলী ইন্দ্রের রথ এনেছিলেন রামের জন্য। সেই রথে চেপে রাম লড়াই করেছিলেন রাবণের সঙ্গে। এবার সেই রথ নিয়ে মাতলী ফিরে গেলেন ইন্দ্রের কাছে। রাম আর রাবণের লড়াই দেখতে দেবতারাও অনেকে এসেছিলেন। এবার তাঁরাও ফিরে গেলেন।

রাবণ ছিলেন লঙ্কার রাজা। সেখানে এবার বিভীষণেরই

রাজা হবার পালা। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ডেকে বললেন, 'ভাই, বিভীষণ এখন লঙ্কার রাজা হবেন। তুমি দরকার মত আয়োজন কর।' লক্ষ্মণ সে আদেশ মাথায় নিয়ে গেলেন আয়োজন করতে। সোনার ঘড়ায় সাত সমুদ্রের জল এলো। সোনার থালায় কত রকমের জিনিস। সোনার মুকুট পরে সোনার সিংহাসনে গিয়ে বসলেন বিভীষণ। কত গান হোল। কত বাজনা বাজল। সবাই খুব খুশী। নতুন রাজাকে কতজন কত রকমের উপহার দিলেন। বিভীষণ কিন্তু সব উপহার এনে রামের পায়ের কাছে রাখলেন। সবকিছু রামকে দিয়েই তাঁর আনন্দ।

এবার সীতাকে নিয়ে দেশে ফিরবেন রাম। হনুমানকে ডেকে বললেন, 'এবার সীতার কাছে যাও। গিয়ে বল লড়াই শেষ হয়েছে। রাবণ নেই। এখন লঙ্কার রাজা বিভীষণ। এখন আমরা দেশে ফিরব। তুমি কিন্তু সীতার কাছে আগে যেওনা। রাজা বিভীষণের অনুমতি নিয়ে তবে ওখানে যেও। সীতার কাছ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। তাঁর সব খবর জেনে এসো।'

রাজা বিভীষণ খুশীমনেই হনুমানকে অনুমতি দিলেন। হনুমান তখন একলাফে অশোকবনে গিয়ে হাজির। সেখানেই ছিলেন সীতা। তিনি একটু ভয় পেয়েছিলেন হনুমানকে দেখে। কী জানি সে হয়ত কোন খারাপ খবরই এনে থাকবে! হনুমান কিন্তু খুব ভালো ভালো খবর শোনালো সীতাকে। সীতার আনন্দ আর ধরেনা। আনন্দে তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। অনেক দুঃখ তিনি সয়েছেন। এবার সব দুঃখের শেষ। এখন রামের কাছে ফিরতে পারবেন তিনি। আনন্দে সীতার মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুলোনা।

নিজেকে একটু সামলে নিলেন সীতা। হনুমানকে বললেন, 'আজ তুমি যে খবর শোনালে আমাকে, তার দাম অনেক। তোমাকে কিছু উপহার দিতে মন চাইছে। কিন্তু আমার কাছে ত কিছুই নেই। একখানা গয়নাও সঙ্গে নেই আমার। রাবণ যখন আমাকে চুরি করে আনছিল তখন আমি সব গয়না পথে ফেলে দিয়ে এসেছি। এখন তোমাকে কিছু দিতে না পারার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে।'

হনুমান বললে, 'মা-গো, এরজন্য কোন দুঃখ কোরোনা তুমি। রাম আদেশ করেছেন। তোমার কাছে আমি কিছু ভালো খবর বয়ে এনেছি এতেই আমার আনন্দ। তোমার পায়ের একটু ধুলো দাও মা! সে আমার কাছে সোনাদানার চাইতে অনেক দামী। আর একটা কথা মা। এই চেড়ীগুলো তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। তুমি অনুমতি দাও মা, আমি ওদের সবগুলোকে আছড়ে মেরে ফেলি।'

সীতা বললেন, 'বাবা হনুমান, তুমি ওদের দোষ দিও না। ওরা সবাই রাবণের দাসী। রাবণ যা আদেশ করত, এরা তাই পালন করত বাধ্য হয়ে। এ ছাড়া ওদের অন্য পথ ছিল না বাবা। আমি খুব কষ্ট পেয়েছি ঠিকই। কিন্তু সে-কষ্ট হয়ত আমার পাওনাই ছিল। তাছাড়া যারা অপরের আদেশে পাপ করে, তাদের সাজা দিতে নেই। আমার কোন অভিমান নেই এই চেড়ীদের ওপর। আমি ওদের মাফ করেছি বাবা হনুমান। তুমি এদের ওপর রাগ কোরোনা। তুমি তাড়াতাড়ি রামের কাছে ফিরে যাও। তিনি হয়ত কত কী ভাবছেন! তাঁকে আমার প্রণাম জানিও। বোলো দেশে ফিরে যাবার জন্য আমি তৈরী। হনুমান সীতাকে প্রণাম করে রামের কাছে ফিরে গেল।

পাখীর দয়া

হরিণ শিকার করতে গিয়েছে শিকারী। তীরে সে বিষ মাখিয়ে নিয়েছে। এ তীরের ছোঁয়া লাগলে আর রক্ষে নেই। ধনুকে তীর লাগিয়ে নিয়ে শিকারী খুঁজে বেড়াচ্ছে হরিণ। দুপুর গড়িয়ে গিয়ে যখন বিকেল হয়েছে, একটা হরিণ দেখল সে। শিকারী বড় খুশী। মনের আনন্দে হরিণের দিকে তীর ছুঁড়ল সে।

হয়ত বেশী আনন্দে শিকারীর হাত একটু নড়েই গিয়েছিল। তীর হরিণের গায়ে লাগলইনা। তীর লাগল গিয়ে খুব পুরানো একটা গাছে। এই সুযোগে হরিণ গেল পালিয়ে। পুরো দিনটাই নষ্ট হোল শিকারীর। মন খারাপ করে সে বাড়ী ফিরে গেল।

এদিকে বিষ মাখানো ছুরি লেগেছে গাছের গায়ে। বিষের কাজ শুরু হয়ে গেল গাছের মধ্যেই। অতবড় গাছটার শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায় বিষ ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে সবুজ পাতাগুলো শুকনো হয়ে গেল। ও গাছটার দিকে তখন আর তাকানোই যায় না।

সেই গাছের কোটরে থাকত একটা টিয়াপাখী। এককালে তাদের বাবা-মাও নাকি ঐ গাছেই থাকত অনেক বছর আগে। টিয়াপাখী এসব কথা শুনেছে ওর বাবা-মার কাছ থেকেই। এ গাছটি তাই তার বড় আদরের। অন্য কোথাও গিয়ে বাসা তৈরীর কথা সে ভাবতেই পারেনা। টিয়াপাখীর এ গাছটি তার বড় আপন। কত ঝড়-জল থেকে ঐতো ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বড় ভালো বাসে টিয়াপাখী তাই এ গাছটিকে।

ভোরে ঘুম থেকে জেগে গাছটিকে দেখল টিয়াপাখী। একী হোল গাছটির? ওর মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। গাছটির ডালপালা, সবুজ-সবুজ যেন শুকিয়ে উঠেছে। এক রাতের মধ্যে কে যেন গাছটিকে মেরেই ফেলেছে। হায় হায় করে উঠল টিয়াপাখী। ওর দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এল। শুকনো ডাল-পালার দিকে তাকিয়ে নিজের কোটরের মধ্যেই বসে রইল টিয়া।

সকাল গড়িয়ে গিয়ে দুপুর হয়। এক সময় সন্ধ্যে হয়ে আসে। গাছের দিকে তাকিয়ে সে বসেই থাকে। তাঁর ক্ষিধে নেই তেষ্টাও নেই। গাছটি যদি মরেই যায়, তাহলে আমারও মরণ হোক ওর সঙ্গে—ভাবে টিয়া। এ গাছের কোটর ছেড়ে সে বাইরে যাবেনা। না, একেবারেই না। ওর পক্ষে তা কখনোই সম্ভব নয়।

ধীরে ধীরে গাছটি শুকিয়ে ওঠে। এদিকে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে টিয়াপাখীর মরণও ঘনিয়ে আসে। সে এক ফোঁটা জলও ছোঁয়নি এ ক'দিন। ওর এই দয়া আর অটল মন দেখে দেবতারা বিচলিত হলেন। এরকম ত কখনো দেখা যায়নি— দেবতারা তাই বলাবলি শুরু করেন নিজেদের মধ্যে। পাখীটিকে বুঝিয়ে বাঁচিয়ে তোলার জন্য দেবতারা ইন্দ্রকে অনুরোধ করলেন।

ইন্দ্র এলেন পাখীটির কাছে। নিজের পরিচয় দিয়ে টিয়া পাখীকে বললেন, 'এ তুমি কী করছ? দেখছনা গাছটি মরে গেছে। ওর সারা গায়ে বিষ ছড়িয়ে গেছে। ওর ডালপালা শুকিয়ে গেছে সেইজন্যই। ফলফুলও ঝরে গেছে সব। দেখ, বাইরে থেকে আর কোন পাখী এসে বসছেনা এর ডালে। এ বনে গাছের অভাব নেই। যে কোন একটি সবুজ সুন্দর গাছে কোটর বানিয়ে নিয়ে থাক

তুমি। বেশ সুখেই থাকবে। এখানে মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছ কেন ? টিয়াপাখী ইন্দ্রের সব কথাই মন দিয়ে শুনল। তারপর দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে বললে, 'কিন্তু তা কি উচিত হবে আমার পক্ষে ? এই গাছের কোটরেই আমার জন্ম। এর ফল খেয়ে, এরই আশ্রয়ে আমি বড় হয়েছি। শুধু কি তাই ? আমার বাবা-মা, তাদের বাবা-মা—সবাই এককালে এই গাছেই থেকেছেন। আজ ওর বিপদের দিনে ওকে ছেড়ে যাওয়া কি আমার উচিত হবে প্রভু ? তার চাইতে এই ভালো। ওর সঙ্গে আমারও মরণ হোক।'

ইন্দ্র বললেন, 'শোন টিয়াপাখী, তোমার এ দয়ার-কোন তুলনা হয়না। তুমি যা বলছ সবই ঠিক। আমি বড় খুশী হলাম। তুমি আমার কাছে বর চাও। যা চাইবে আমি তাই দোব তোমাকে।'

টিয়াপাখী বললে, 'বর যদি দেবেন প্রভু, তবে আপনি এক্ষনি গাছটিকে বাঁচিয়ে দিন। আমার আর কোন প্রার্থনা নেই আপনার কাছে।'

ইন্দ্র খুশী হয়ে বললেন, 'তবে তাই হোক। তোমার দয়ার গুণেই বেঁচে উঠুক গাছটি।' এই বর দিয়ে ইন্দ্র চলে গেলেন।

দেখতে দেখতে বেঁচে উঠল গাছটি। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল সে। সবুজ হয়ে গেল তার সব পাতা। ডালপালা, ফল আর ফুলে ভরে গেল। সব দেখে টিয়াপাখীর কী আনন্দ। আনন্দে তখন তার দু'চোখে জল এসে গিয়েছে।

পশুর দয়া

ব্রহ্মদত্ত তখন কাশীর রাজা। শহরের বাইরে শ'পাঁচেক ছুতোরমিস্ত্রী বাস করত। ওরা ওদের কাজের জন্যই দূর বনে যেত কাঠ আনতে। আনত এক জায়গায়। এরপর নদীর জলে ভেলায় করে কাঠ ভাসিয়ে নিয়ে আসত গাঁয়ে।

সেবার ছুতোরেরা বনে কাঠ জোগাড় করছে গাছ কেটে। হাতীর-পাল এলো ওদের কাজকর্ম দেখতে। ওই পালে ছিল খুব বড় একটা হাতী। গভীর বনে ফিরে যাবার সময় ওর হোল বিপদ।

ওর পায়ে ছোট্ট একটা কাঠের টুকরো গেল ফুটে। বনে আর চলতেই পারে না। বনে ফিরে গিয়ে বিশেষ কষ্টে পড়ল সে। দিন দিন ব্যথা তার বাড়তেই লাগল। হাতীটি তখন স্থির করল, ও ছুতোরদের কাছেই ফিরে আসবে। ওরা নিশ্চয় ওকে সারিয়ে তুলতে পারবে।

অনেক কষ্টে হাতী এসে পোঁছল ছুতোরদের কাছে। ওকে খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটতে দেখে ছুতোররা সব চললো। ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে, একজন ওর পা থেকে কাঠের টুকরোটা বার করে দিল। আর একজন কীসব পাতা এনে তার রস লাগিয়ে দিল ব্যথাটার জায়গায়। দু' একদিনের মধ্যেই ওর ব্যথা গেল সেরে।

এর মধ্যেই হাতিটি কিন্তু ছুতোরদের সঙ্গে খুব ভালোবাসা হয়ে গিয়েছে। ওর আর মন চাইলোনা বনে ফিরে যেতে। বন্ধুদের ছেড়ে কি যাওয়া যায়? নাকি, উপকারীর উপকার না করে পারা

যায়? ছুতোরদের কাঠ বয়ে আনার কাজেও সাহায্য করে। ছুতোরেরা ওকে পেট ভরে খাওয়ায়। বড় সুখেই হাতীটির দিন কাটে। ছুতোরদেরও উপকার হয় খুব। কত কাজইত হাতী করে দেয়। এমনকি কাজের শেষে কুড়লগুলো গুছিয়ে আনা পর্যন্ত।

কিন্তু কতদিন এভাবে সাহায্য করতে পারবে হাতী? সে ত বুড়ো হয়েছে। একদিন মরে যাবে না সে? সেদিন ছুতোর বন্ধুদের কে সাহায্য করবে? তার মনে হোল, সে একটা কাজ করতে পারে। তার ছেলেকে এনে রেখে দেবে ছুতোরদের কাছে। তার বয়স কম, দেখতে শুনতেও ভালো। সে অনেকদিন ধরে ছুতোরদের কাজ করে দিতে পারবে। মন ঠিক করে নিয়ে হাতী চলল তার ছেলেকে আনতে।

কী সুন্দর সাদা গায়ের রঙ আর সুন্দর গড়ন ছেলে-হাতীর। তাকালে আর চোখ ফেরানো যায়না। বুড়োহাতী ছেলেকে দেখিয়ে বললে, 'নাও, তোমরা বরং একেই কাছে রেখে দাও। আমি আর ক'দিনই বা বাঁচব! এ তবু অনেকদিন ধরে তোমাদের সাহায্য করতে পারবে। আমার কিছু ঋণ শোধ হবে। ছেলেকে রেখে এরপর বুড়োহাতী গভীর বনে চলে গেল।

ছেলে-হাতী বাপের মতই ছুতোরদের কাজ করে দেয়। ছুতোররা ওকে খুব ভালোবাসে। দেখতে দেখতে কী সুন্দর হয়ে উঠল হাতীটি। শেষে একদিন এ খবর গিয়ে পৌঁছল রাজার কাছে। ব্রহ্মদত্ত শুনলেন এই সুন্দর সাদা হাতীর কথা। তিনি মন্ত্রী আর লোকজন নিয়ে বনে এলেন। হাতীটিকে তিনি নিয়ে যাবেন রাজধানীতে। রাজার ইচ্ছায় বাধা দেবে কে? ছুতোররা সাদা হাতীটিকে দিয়ে দিল রাজাকে।

হাতী সব শুনে বললে, 'রাজা, আপনি ওদের জিনিস নিয়ে যাচ্ছেন। কিছু দাম ওদের দেবেন না ?' রাজা বললেন, 'তুমিই বল, আমি ওদের কী দাম দোব ?' হাতী বললে, 'ওদের প্রত্যেককে দশ হাজার করে মোহর দিতে আদেশ করুন। আর ওদের ছেলে-মেয়েদের নতুন জামাকাপড় দিয়ে দিন।'

রাজা তক্ষুনি সব ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর সাদা হাতী চলল রাজার রাজধানীতে। ওখানে গিয়ে হাতীর আদর যত্ন আরও বাড়ল! সে রাজার বড় প্রিয়। রাজাকে সেও কিন্তু কম ভালোবাসেনা। এক একদিন তাকে খুব সুন্দর করে সাজানো হয়। সেদিন রাজা হাতীতে চেপে শহর দেখতে বেরোন। মনের আনন্দে হাতীর দিন কাটে।

এই রাজার ছেলেই এককালে বুদ্ধদেব বলে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু ছেলে জন্মাবার আগেই রাজার মৃত্যু হোল, হাতী এ শোক সইতে পারবে না বলে তাকে এ খবর দেওয়া হোলনা। এদিকে কোশলের রাজা খবর পেলেন, ব্রহ্মদত্তের মৃত্যু হয়েছে। তিনি এগিয়ে এলেন কাশী-রাজ্য দখল করে নিতে। রাজ্যে রাজা কেউ নেই, এই ত সুযোগ।

কাশীরাজের মন্ত্রী আর লোকজনেরা ভীষণ চিন্তায় পড়লেন। ওঁরা শহরের বাইরে গিয়ে কোশলরাজের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, 'আপনি আমাদের সাতদিন সময় দিন। এর মধ্যে আমাদের যুবরাজ অবশ্যই জন্মাবেন, তা যদি না হয়, সাতদিন পরে আপনি কাশীর রাজা হবেন। কোশলরাজ রাজী হয়ে শহরের বাইরে তাঁবুতে রইলেন। তাঁর সৈন্যেরাও সব রইল তাঁর সঙ্গেই।

ঠিক সাতদিনের দিনই রজাপুত্রের জন্ম হোল। কাশীর

লোকজনের তখন আনন্দ দেখে কে! এরা কোশলসেনাদের সঙ্গে লড়াই শুরু করে দিল। ওরা কিন্তু লড়াই ভালো জানত। তাছাড়া তারা সংখ্যায়ও ছিল বেশী। কাশীর সেনারা তাই হারতে শুরু করল। শেষে ওরা সবাই ঠিক করল সব কথা হাতীকে জানাবে। হাতী যদি পারে ত এর একটা প্রতীকার করুক। রাণীও বরং ছেলেকে নিয়ে যান হাতীর কাছে।

কথামত মন্ত্রী আর কয়েকজন গেলেন হাতীর কাছে। রাণীও গেলেন যুবরাজকে কোলে করে। সবাই হাজির হলেন হাতীশালায়। মন্ত্রী নিজেই সব কথা হাতীকে বললেন। বললেন রাজার মৃত্যুর কথা। যুবরাজের কথা। ওদিকে কোশলরাজের সঙ্গে লড়াইর কথা। সব শুনে হাতীর দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল।

হাতী এরপর এগিয়ে এলো রাণীর কাছে। সাবধানে তুলে নিল ছোট্ট সুন্দর যুবরাজকে শুঁড় দিয়ে। অনেকখানি আদর করল যুবরাজকে দুলিয়ে দুলিয়ে। আর কাঁদলও খুব।

হাতী যুবরাজকে এরপর ফিরিয়ে দিল রাণীর কোলে। মন্ত্রীমশাইকে বলল, 'শহরের দরজা খুলে দিন, আমি কোশলরাজকে উচিত সাজা দোব।'

লোকজনেরা হাতীকে বড় সুন্দর করে সাজালো। তারপর একসময় শহরের দরজা খুলে গেল। হাতী খুব জোরে চীৎকার করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল কোশলরাজের শিবিরের ওপর। ওর লোকজনেরা ভয়ে পালাতে শুরু করল। প্রাণ নিয়ে পালাল সেনারাও। কোশলরাজও কিন্তু রেহাই পেলেন না। তাঁর শিবির ভেঙে তছনছ করে দিল হাতী। তারপর সে গিয়ে পৌঁছল রাজার

সামনে। ততক্ষণে কাশীর লোকজনেরাও মার্ মার্ কাট কাট করে গিয়ে পড়েছে ওখানে।

হাতী কোশলরাজের চুলের ঝুঁটি ধরে তুলে নিয়ে এলো রাজবাড়ীতে। সবাই চেঁচাতে শুরু করল 'ওকে মেরে ফেল। 'ওকে আছড়ে মার।' হাতী কিন্তু তা করল না। দয়া করল কোশলরাজকে। বলল, 'মনে রেখো, আমাদের যুবরাজ আছেন। ক'দিন পরে রাজা হয়ে বসবেন কাশীর। কাশীর লোভ তুমি কোনোদিন কোরোনা। তা যদি কর, তোমার আর রক্ষে থাকবে না। তখন কিন্তু তোমাকে আর দয়া দেখাবোনা।'

কোশলরাজও তখন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন।

———

হরিশচন্দ্রের দান

দেবরাজ ইন্দ্র বসে আছেন সভায়। তাঁকে ঘিরে বসে আছেন দেবতা আর মুনিঋষিরা। বড় দাতা কে সেই নিয়ে আলোচনা চলছে। সব চেয়ে বড় সত্যবাদী কে সে নিয়েও আলোচনা হোল অনেক। বশিষ্ঠ আর বিশ্বামিত্র ছিলেন সে আলোচনায়। বশিষ্ঠ বললেন রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা। তাঁর মতে হরিশ্চন্দ্রই বড় দাতা আর বড় সত্যবাদী। বিশ্বামিত্র এ কথা মানতে রাজী হলেন না। শেষে স্থির হোল বিশ্বামিত্র রাজাকে যাচাই করে দেখবেন। এ কাজে তাঁর পাশে রইলেন শনি।

রাজসভায় বসে আছেন হরিশ্চন্দ্র। কত লোক কত আশা নিয়ে আসছে তাঁর কাছে। সবার আশা তিনি পূর্ণ করছেন হাসিমুখে। এমন সময় একজন এসে বললেন, 'রাজা আমি বড় গরীব। কিন্তু আমি যা চাইব তা কি আপনি দেবেন?'

হরিশ্চন্দ্র বললেন, 'আপনি যা চাইবেন, আমি অবশ্যই তা আপনাকে দোব। আপনি দয়া করে বলুন, কী চাই আপনার। লোকটি তখন চেয়ে বসলেন রাজার পুরো রাজ্যটাই। রাজা তাঁকে রাজ্য দান করেদিলেন। এরপর হরিশ্চন্দ্র আর রাজা রইলেননা। কিন্তু দানের দক্ষিণা? কী করে দক্ষিণা দেবেন তিনি। লোকটি দানের দক্ষিণা নেবার জন্য তখনো দাঁড়িয়ে। রাজ্য নেই, রাজা তখন পথের ভিখারী। কী করেন? হরিশ্চন্দ্র তখন নিজেকে,

স্ত্রী শৈব্যা আর ছেলে রুহিদাসকে বেচে দিলেন। যে অর্থ পাওয়া গেল এভাবে তাই দিয়ে দিলেন দক্ষিণা। শনি কিনে নিলেন শৈব্যা আর রুহিদাসকে। একজন ডোম কিনল হরিশ্চন্দ্রকে।

এর পরই শুরু হোল ওদের দুঃখ-কষ্ট। চলল পরীক্ষার পর পরীক্ষা। শনি আর ডোম দু'জনে নানারকমের কষ্ট দিতে থাকল ওদের। শনি শেষ পর্যন্ত রুহিদাসের মৃত্যু ঘটালেন। সাপের কামড়ে বেচারার মৃত্যু হোল। মা শৈব্যা কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। শনি কিন্তু শৈব্যাকে কাঁদতেও দেবেননা। কাঁদলেই চলবে? কাজকর্ম করবে কে?' শনি রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমার কান্না থামাও। ছেলেকে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে এসো। যাবে আর আসবে। দেরী কোরোনা যেন।'

শৈব্যা মড়া ছেলেকে বুকে করে মড়াপোড়ানোর যে জায়গা ছিল সেখানে গেলেন। ওখানে কিছু পয়সা লাগে। শৈব্যার কাছে পয়সা নেই। ডোমের সে জায়গা। হরিশ্চন্দ্র পয়সা না পেলে মড়া পোড়াতে দেবেনা। পাগলের মত শৈব্যা ওখানে ঢুকে পড়লেন। কোনরকমে ছেলের দেহটাকে পোড়াতে চাইলেন। কিন্তু তা আর হোলনা। পয়সা দেওয়া হয়নি। ডোম তাই রুহিদাসের আধপোড়া শরীরটাকে টেনে ফেলে দিল। ছেলের সেই আধপোড়া শরীরটাকে বুকে নিয়ে মা শৈব্যা বসে রইলেন। দুঃখের আঘাতে চোখের জলও তখন শুকিয়ে গিয়েছে তাঁর।

কিন্তু দুঃখের যেন শেষ নেই। খবর রটে গেল। সবাই শুনল, এক ডাইনীর কথা। সে তাঁর ছেলেকে পোড়াতে গিয়েছিল, পারেনি। এখন সে আধপোড়া ছেলেকে নিয়ে বসে আছে। হাজার হাজার লোক এলো ডাইনী দেখতে। এ অপরাধে তুলনা নেই।

দেশের রাজা ডাইনীর কথা শুনলেন। তিনি আদেশ পাঠালেন, ডাইনীকে হত্যা করতে হবে।

এমনি যখন একটার পর একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে, সেই লোকটি এলেন হরিশ্চন্দ্রের কাছে। এসে বললেন, 'হরিশ্চন্দ্র, তুমি আমাকে চিনতে পারছ? আমাকে তুমি তোমার রাজ্য দান করেছিলে। তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়। তুমি ইচ্ছে করলে তোমার রাজ্য ফিরিয়ে নিতে পার। তোমাকে ভেবে দেখবার সময় দিচ্ছি আমি।'

হরিশ্চন্দ্র বললেন, 'তা কি হয় কখনো? দান করা জিনিস কখনোই ফিরিয়ে নেওয়া যায়না। আমার ভেবে দেখবার কোন দরকার নেই। আপনি রাজ্য ভোগ করুন। এসব দুঃখ-কষ্ট আমার কপালের লিখন।'

এদিকে শৈব্যাকে হত্যা করবার ভারও পড়ল হরিশ্চন্দ্রের ওপর। রাজার আদেশ পালন করা ছাড়া উপায় নেই। তিনি তৈরী হয়ে নিলেন রাজার আদেশ পালন করবার জন্য। তিনি যখন শৈব্যাকে হত্যা করতে যাচ্ছেন, আকাশে দেবতারা 'ধন্য' 'ধন্য' করে উঠলেন। বিশ্বামিত্র এবার হরিশ্চন্দ্রের কাছে ধরা দিলেন। বললেন, 'আমরা তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। তোমার মত দাতা আর সত্যবাদী কেউ নেই। তুমি ধন্য হরিশ্চন্দ্র। তোমার তুলনা নেই।'

হরিশ্চন্দ্র সব ফিরে পেলেন। রুহিদাস বেঁচে উঠলেন। শৈব্যা আর রুহিদাসকে নিয়ে আবার তিনি রাজা হয়ে বসলেন।

বলিরাজার দান

দৈত্যদের রাজা বলি। খুব বলবান রাজা। ইন্দ্রের ওপর তাঁর খুব রাগ। ইন্দ্র বলির বাবা বিরোচনকে হত্যা করেছেন। ইন্দ্রের সঙ্গে লড়াইতে বলি একবার হেরে গেলেন। মনের দুঃখে তিনি সাধনায় বসলেন। খুব কঠিন সাধনা করলেন তিনি। এঁর সাধনায় খুশী হয়ে ব্রহ্মা বর দিলেন। ব্রহ্মার বরে বলি হলেন অজেয় আর অমর।

বলি ছিলেন পাতালের রাজা। এবার তিনি আগে পৃথিবী জয় করে নিলেন। তারপর দেবতাদের হারিয়ে তাঁদের রাজ্যও কেড়ে নিলেন বলি। তিনভুবনের রাজা হয়ে বসলেন বলি।

দেবতাদের মা অদিতি। ছেলেদের দুঃখ তিনি সইতে পারলেন না। তিনি শুরু করলেন নারায়ণের সাধনা। কঠিন সে সাধনা। রোদ-জল মাথায় করে বছরের পর বছর চলল সে সাধনা। শেষে এই সাধনায় নারায়ণের আসন টলল। তিনি অদিতিকে দেখা দিলেন। তিনি ত সবই জানেন। দেবতাদের দুঃখ-কষ্টের কথা সব জেনেছেন নারায়ণ।

নারায়ণ বললেন, 'অদিতি, তুমি কেন আমার সাধনা করছ, তা আমি জানি। আমি জানি তোমার ছেলেরা তাদের রাজ্য হারিয়েছে। সেখানে এখন বলি রাজা হয়ে বসেছে, তাও আমি জানি।' অদিতি তখন হাতজোড় করে বললেন, 'এর কিছু একটা উপায় করুন আপনি। এ দুঃখ আর সহ্য হয় না।'

নারায়ণ বললেন, 'তোমার আশা পূর্ণ হবে অদিতি। আমি তোমার ছেলে হয়ে জন্মাব। তারপর আমি বলিকে সাজা দোব। তুমি কোন চিন্তা করো না।'

অদিতি খুব খুশী হলেন। সব কথা স্বামী কশ্যপকেও বললেন। নারায়ণ নিজে তাঁদের ছেলে হয়ে আসছেন, তাঁদের আনন্দ আর ধরেনা। এক সময় সত্যিই অদিতির ছেলে হোল। ছেলেটি বামন—খুব বেঁটে। কিন্তু হলে কি হয়, কী সুন্দর রূপ তার! রূপের আলোয় দশদিক আলো হয়ে গেল যেন।

জন্মের পরেই বামন বাবা কশ্যপকে বললেন, 'আমার উপনয়ন দিয়ে দিন। বলি বিরাট যজ্ঞ করছে। অনেক দান-ধ্যান করছে। আমি তার কাছে দান নেবার জন্য যাবো।' বাবা কশ্যপ বামনের উপনয়ন করে দিলেন।

ওদিকে বলি বিরাট যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। তিনভুবনের রাজা তিনি। মনে মনে তাঁর গর্ব খুব। বামন গিয়ে পৌঁছলেন বলিরাজার কাছে। ছোটখাট মানুষ, কিন্তু শরীর থেকে আলো বেরোচ্ছে যেন। বলি হাতজোড় করে এগিয়ে এলেন বামনের কাছে। বললেন, 'আমি ভাগ্যবান। আপনি দান নেবার জন্য এসেছেন। যে যা চাইছে আমি তাকে তাই দান করছি। বলুন প্রভু, আপনার কী চাই।'

বামন বুঝলেন বলির গর্বের কথা। তিনি কিন্তু খুব বিনয় করে বললেন, 'আমি বামন। আমি বেশী কিছুই চাইনে। পুজোয় বসবার জন্য আমার একটুখানি জায়গা দরকার। আমি তিনবার পা ফেললে যতটুকু হয়, ততটুকু জায়গাই আমার দরকার।'

বলি মনে মনে হাসলেন। বললেন, 'আমি তিনভুবনের রাজা।

আপনি ছোটখাট একটা রাজ্য নিন বরং। কম করে একটা গ্রাম বা নগর নিন। আপনি সেখানে সুখে থাকতে পারবেন।'

বামন বললেন, 'তাতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমার তিনটি পা ফেলার মত জায়গাই চাই। তার বেশী নয়। আপনি যদি চান ওইটুকুই আমায় দিন।'

বলির গর্বে ঘা লাগল। তিনভুবনের যিনি রাজা, তাঁর কাছে মাত্র তিন-পা ফেলার মত জায়গা চাওয়া! যাইহোক, বলি বামনকে বললেন, 'নিন, আপনি তিন-পা ফেলার মত জায়গাই নিন।'

বলির কথা শেষ হোল। আর অমনি বিরাট চেহারা হয়ে গেল বামনের। এক-পা ফেললেন তিনি। ওই পায়ে সারা পৃথিবী ভরে গেল। আর এক-পা বাড়ালেন বামন আকাশের দিকে। তাতে দেবতাদের রাজ্য ঢাকা পড়ল। আর এক পা? কোথায় তিনি ফেলবেন সে পা? আর ত জায়গা নেই। তিনি বলিকে বললেন, 'রাজা এবার বল, আর এক পা আমি রাখব কোথায়।'

বলির গর্ব তখন চূর্ণ হয়ে গেছে। তিনি তখন হাঁটুগেড়ে বসলেন বামনের সামনে। হাতজোড় করে বললেন, 'প্রভু, আপনার আর এক-পা আমার মাথায় রাখুন। আমি যে কথা দিয়েছি, এতেই সে কথা রক্ষা হবে।'

বলির মাথায় বামন এক-পা রাখলেন। এরপর তিনি নারায়ণ হয়ে দেখা দিলেন। তাঁর আদেশে এলো গরুড়। গরুড় বলিকে নিয়ে গেল পাতালে। নারায়ণের আদেশে তাঁকে থাকতে হোল সেখানেই।

শিবিরাজার দান

রাজা শিবিকে দেবতারাও ভয় পেতে শুরু করলেন। কোন রাজা একটু বড় হয়ে উঠলে বা একটু বেশী পুণ্য সঞ্চয় করলেই দেবতাদের ভয়। এই বুঝি তাঁদের রাজ্য যায়। শিবি বড় রাজা। দান-ধ্যান করে অনেক পুণ্যও করেছেন। দেবতারা তাই শিবিকে যাচাই করে দেখতে চাইলেন।

রাজা শিবি বসে আছেন রাজসভায়। কাছেই আছেন রাণী আর তাঁদের ছেলে। রাজার দরবারে মন্ত্রী, সেনাপতি আর অন্যান্য লোকজনেরাও রয়েছেন। হঠাৎ একটা পাখী উড়ে এসে বসে পড়ল রাজার কোলে। বেচারা তখন ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। ঠিক তার পেছনে পেছনে উড়ে এসে ঢুকল একটা বাজপাখী। তখন রাজা ঘটনাটা বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন আর যারা সেখানে ছিলেন, সবাই। ভয় পাওয়া পাখীটিখে রাজা সাবধানে ধরে থাকলেন।

বাজপাখী রাজাকে আর কোলেবসা পাখীটিকে দেখল মন দিয়ে। এরপর মানুষের গলায় বলে উঠল, 'রাজা, ওই পাখীটিকে আপনি ফিরিয়ে দিন। রাজা মৃদু হেসে বললেন, 'তা কী করে হয়? ও বেচারা ভয় পেয়ে আমার কাছে এসে লুকিয়েছে। ওকে ত আমি আর ফিরিয়ে দিতে পারিনে। বিপদের মুখেও ঠেলে দিতে পারিনে।'

—কিন্তু আমার খুব খিদে পেয়েছে। ওই পাখীটিই আমার খাদ্য। আপনি কি আমাকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলতে চান ?

—না, তা নয়। তবে যে বিপদে পড়েছে তার পাশে দাঁড়ানোও রাজার কাজ। এ পাখীটি বিপদে পড়েই আমার কাছে এসেছে। একে আমার বাঁচাতেই হবে।

—তাহলে কি আমি খেতে পাবোনা ? না খেয়েই মরব ?

—না, তাও আমি বলছিনে। তোমার খাওয়ার একটা ব্যবস্থা আমিই করব। তুমি বল কী খেতে চাও ? যে খাবার তুমি যতটা চাও—তাই আমি আনিয়ে দোব তোমার জন্য।

বাজপাখী বললে, 'কিন্তু রাজা, আপনি কি জানেন না যে, আমরা শুধু কাঁচা মাংসই খাই। আপনি দয়া করে পাখীটিকে ফিরিয়ে দিন। আমি খেয়ে বাঁচি।'

রাজা বললেন, 'তুমি আমায় একটু সময় দাও। আমি তোমার খাবার জন্য বেশ খানিকটা মাংস আনিয়ে দিচ্ছি।'

—তাহলে আমিও বলি, অন্য মাংসে আমার রুচি নেই। মনে হয়, পাখীটাকে আপনি ফিরিয়ে দিতে চাননা। তা যদি হয়, তাহলে ওরই ওজনে আপনার শরীর থেকে মাংস দিতে হবে। দেবেন আপনি ?

রাজা বললেন, 'অবশ্যই দোব। এছাড়া তোমার আর কিছু বলার আছে ?' বাজপাখী বললে, 'আপনি আপনার শরীরের ডানদিক থেকে মাংস কাটবেন। আর এখানে আপনার রাণী আর ছেলে থাকবেন। তাঁরা চলে গেলে হবেনা।

রাজা শিবি বাজপাখীর সব কথাই মেনে নিলেন। ওজন করার জন্য দাঁড়িপাল্লা এলো। সভায় রাণী আর রাজপুত্র বসে রইলেন।

পাল্লার একদিকে পাখীটিকে বসিয়ে দিলেন রাজা। তারপর নিজের শরীরের ডানদিক থেকে মাংস কেটে কেটে পাল্লায় ফেলতে লাগলেন। কিন্তু রাজা অনেকখানি মাংস কেটে পাল্লায় ফেলার পরও ছোট্ট পাখীর সমান ওজন হোলনা। সবাই অবাক হয়ে দেখতে লাগলেন। রাজা যত মাংস কেটে দেন, পাখীর ওজন ততই বেড়ে চলে।

এক সময় বাজপাখী দেখল রাজার বাঁ-চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। বাজপাখী বলে উঠল, 'থাক্ রাজা, আপনার কষ্ট হচ্ছে। আর মাংস দিয়ে কাজ নেই।'

শিবি মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ। আমি শুধু আমার ডানদিকের মাংসই দান করতে পারছি। বাঁ-দিকটা তাই দুঃখ করছে। তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে বাঁ-দিক থেকেও কিছুটা কেটে দিই।'

দেবতারা আড়াল থেকে সব দেখছিলেন। আর তাঁরা রাজা শিবিকে কষ্ট দিতে চাইলেন না। দু'টি পাখীর বদলে ওরা দেখা দিলেন দু'জন দেবতা। আকাশ থেকে শিবিরাজার মাথায় রাশি রাশি ফুল ঝরে পড়ল। সেদিন থেকে শিবিরাজার দানের কথা ইতিহাসে লেখা রইল।

কর্ণের দান

সবাই জানে যুধিষ্ঠীর, ভীম, অর্জুন এরা পাঁচ ভাই। আসলে ওঁরা ছ'ভাই। ভায়েদের মধ্যেও এ-কথা কেউ জানতেন না। শুধু একজনই জানতেন একথা। তিনি হলেন মা কুন্তী। কর্ণও আসলে কুন্তী দেবীরই ছেলে। কর্ণের জন্মের পর কোন কারণে মা কুন্তী তাঁকে নদীতে ভাসিয়ে দেন। একজন সাধারণ মানুষ ছেলেটিকে জল থেকে তোলেন। তিনিই তাঁকে লালন-পালন করেন। তিনিও কর্ণের বাবা মা যে কে তা জানতেন না।

যুধিষ্ঠীরদের সঙ্গে দুর্যোধনদের ভীষণ লড়াই বাধল। সারা ভারতের রাজারা সে লড়াইতে জড়িয়ে পড়লেন। বেশীর ভাগ রাজা রইলেন দুর্যোধনের দিকে। কর্ণও যোগ দিলেন এঁদের দিকে। তিনি ত জানতেনইনা যে যুধিষ্ঠীরেরা তাঁর আপন ভাই। কর্ণ খুব বড় বীর ছিলেন। তিনি রাজার ছেলে নন। তাই সবাই তাঁকে অপমান করত। দুর্যোধন তাঁকে একটা রাজ্য দান করে রাজা বানিয়ে দিয়েছিলেন। কর্ণ তাই দুর্যোধনকে বেশী ভালোবাসেন। তাঁর হয়ে বড় শত্রু অর্জুনকে কর্ণ নিজেই বধ করবেন ঠিক করেছিলেন।

সব দেখে শুনে কুন্তীদেবীর মনে খুব কষ্ট। ভাই ভায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবে! ভাই ভাইকে হত্যা করবে! এসব কুন্তীদেবীর সইলনা। তিনি লুকিয়ে কর্ণের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে সব পরিচয় জানিয়ে দিলেন। সব জেনে শুনে কর্ণের মন খারাপ হয়ে

গেল। তিনি বললেন, 'এক অর্জুন ছাড়া অন্য কাউকে তিনি হত্যার চেষ্টাই করবে না। হয় কর্ণ, নয়ত অর্জুন বেঁচে থাকবেন। কুন্তী পাঁচ ছেলেরই মা থাকবেন চিরকাল।'

বীর অর্জুনের সখা কৃষ্ণ। তিনি জানেন কর্ণ বড় দাতা। তিনি ভাবলেন কর্ণকে একবার যাচাই করে দেখবেন। বুড়ো বামুন সেজে তিনি এলেন কর্ণের কাছে। কর্ণ হাতজোড় করে তাঁকে বললেন, 'বলুন, কীভাবে আপনার সেবা করব আমি?' বুড়ো বামুন বললেন, 'আমি কাল থেকে খাইনি। উপোস করে আছি। আমার খাবার ব্যবস্থা করুন।'

কর্ণ বললেন, 'নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করব। কিন্তু আপনি বলুন কোন্ কোন খাদ্য আপনার প্রিয়? আমি সেইসবই আনিয়ে দোব। আপনার জন্য আনিয়ে দিতে পারি অন্য কিছু খাবার, অবশ্য আপনি যদি চান।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'শোন রাজা, আমি শুধু মাংসই চাই—রান্না করা মাংস। কিন্তু যে-সে মাংস খাবো না। তোমার ছেলে আছে। তুমি চোখের জল না ফেলে সেই ছেলেকে হত্যা করবে। একাজে তোমাকে সাহায্য করবে তোমার রাণী। তারপর সেই ছেলের মাংসই তোমরা রান্না করে আমাকে দেবে। এ যদি পার তাহলে আমি তোমার এখানে খেতে রাজী। নইলে আমি খিদে নিয়েই ফিরে যাব।'

কর্ণ ব্রাহ্মণের কথামত সব করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দেখা দিলেন আর কর্ণের ছেলেকেও বাঁচিয়েও দিলেন। কর্ণের মত দাতা যে আর কেউ নেই, এ কথা সবাই মেনে নিলেন।

খুব বড় বীরও ছিলেন কর্ণ। লড়াইতে তাঁকে হারানো সহজ

ছিল না। একথা সবাই জানতেন। দেবতারা খুব ভাবনায় পড়ে গেলেন। তাঁরা কিন্তু জানতেন কর্ণের শক্তি কোথায়। কর্ণ যখন জন্মান তখন তাঁর গায়ে কবচ আর কুণ্ডল ছিল। ওসব নিয়েই জন্মেছিলেন তিনি। ওগুলো কর্ণের গায়ে থাকলে তাঁকে কেউ হারাতে পারবে না। ইন্দ্র ঠিক করলেন কর্ণের কাছ থেকে ওগুলো নিয়ে নিতে হবে। তাহলে অর্জুন সহজেই কর্ণকে হত্যা করতে পারবে।

ইন্দ্র বুড়ো বামুন সেজে এসে বললেন, 'আমি বড় গরীব, আমাকে কিছু দান দিন।' কর্ণ বললেন, 'নিশ্চয়ই দোব। বলুন দয়া করে, আপনি কী পেলে খুশী হন? ব্রাহ্মণ কর্ণের কাছে তার কবচ আর কুণ্ডল চেয়ে বসলেন। হাসিমুখে কর্ণ শরীর থেকে কেটে কবচ-কুণ্ডল দিয়ে দিলেন। কর্ণ যে লড়াইতে হারবেন তার পথ তৈরী হয়ে গেল। কিন্তু দাতা হিসেবে তাঁর নাম অমর হয়ে রইল।

সখার কথা

পাশা খেলায় হেরে গেলেন যুধিষ্ঠিরেরা। ওঁরা হেরে গেলেন কৌরবদের কাছে। এবার তাঁদের বনে যেতে হবে বারো বছরের জন্য। তারপর আরও একবছর তাঁদের লুকিয়ে থাকতে হবে কোথাও। এবার কৌরবরা সারা দেশের রাজা হয়ে বসলেন।

যুধিষ্ঠিরেরা পাঁচ ভাই বনে গেছেন। তবু কৌরবদের মনে সুখ নেই। দিনরাত ভাবছেন কী করে ঐ বনের মধ্যেই তাঁদের বিপদে ফেলবেন। ওঁরা যদি বন থেকে কোনদিনই না ফেরেন, খুব ভালো হয়। কৌরবদের রাজা হয়ে থাকার পথে আর কোন বাধা থাকে না।

মুনি দুর্বাসা ভীষণ রাগী। একটুতেই রেগে গিয়ে অভিশাপ দেন। সবাই ভয় পায় তাঁকে। তিনি এলেন কৌরবদের রাজসভায়। তাঁর সাথে আরও দশ হাজার শিষ্য। কৌরবের রাজসভায় সবাই হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজা দুর্যোধন বললেন, 'প্রভু আদেশ করুন, আপনাদের সেবার জন্য আমরা কী করব? এরপর দুর্বাসা যা যা বললেন, দুর্যোধন সবতাই করলেন। মুনি খুব খুশী হলেন।

দুর্যোধন ভাবলেন মুনি আর শিষ্যদের বনে পাঠানো যাক। সেখানে যুধিষ্ঠীরেরা কোন খাতির যত্ন করতে পারবে না। মুনির অভিশাপে সবাই মারা পড়বেন।

দুর্যোধন মুনিকে বললেন, 'প্রভু, যুধিষ্ঠির আর তাঁর ভায়েরা বনবাসে গেছে। যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি বলে ওদের বড় দুঃখ হয়েছিল। আপনি যদি বনে গিয়ে ওদের অতিথি হন, ওরা খুব খুশী হবে।'

দশ হাজার শিষ্য নিয়ে দুর্বাসা গিয়ে হাজির হলেন বনে। তখন বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। যুধিষ্ঠীর এসে মাথা নত করে দাঁড়ালেন। তাঁর পেছনে বাকী চার ভাই। মুনি বললেন, 'আজ রাতে আমরা তোমাদের এখানে আহার করব। তোমরা আয়োজন কর। আমরা নদীতে যাচ্ছি। হাত মুখ ধুয়ে, পুজো পাঠ সেরে একটু পরে ফিবর।'

পাঁচ ভায়ের এক স্ত্রী। তাঁর নাম দৌপদী। তাঁকে ডেকে ভায়েরা সবকথা বললেন। তিনি সব শুনে বললেন, 'সূর্য ডোবার পর আমি কাউকে একমুঠোও খেতে দিতে পারেনে। তখন আর আমার হাঁড়িতে কিছুই থাকেনা। দিনের বেলায় আমি দশ কেন বিশ হাজার লোককে খাওয়াতে পারি। আপনারা ওঁদের যে করে পারেন কাল সূর্য ওঠার পর খাওয়াবার ব্যবস্থা করুন। তখন কোনরকম অসুবিধে থাকবেনা আমার।'

কিন্তু তা কী করে হয়। মুনি তাঁর লোকজন নিয়ে রাত্রের অতিথি। ভায়েরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। দ্রৌপদীও বড় ভাবনায় পড়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা। তিনি 'সখা' বলেই ডাকেন কৃষ্ণকে। দ্রৌপদী মনে মনে তাঁকেই ডাকতে শুরু করলেন।

দ্রৌপদীর মনের ডাক শুনলেন কৃষ্ণ। তিনি এসে হাজির হলেন। সবকথা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন, 'আগে আমাকে কিছু খেতে দাও। আমার নিজেরই ভীষণ খিদে

পেয়েছে। খাওয়ার পর মুনি আর লোকজনের কথা ভাবব।' দ্রৌপদী তাঁর রান্নার হাঁড়ি এনে দেখালেন, ওতে কিছুই নেই। কৃষ্ণ দেখলেন ওতে একটা শাকের পাতা লেগে আছে। ওইটি তুলে মুখে ফেললেন। বললেন, 'এই ত আমার পেট ভরে গেল। আমার আর খিদে নেই।'

ওদিকে নদীর তীরে মজার ব্যাপার ঘটল। মুনি আর দশহাজার শিষ্যেরও পেট ভরে গেল। খিদেই নেই যখন, তখন আর যুধিষ্ঠিরদের কাছে গিয়ে লাভ নেই। ওঁরা ফিরলেন দিনের বেলায়। তখন সূর্য উঠেছে। ওঁরা ফিরলেন দেখে পাঁচ ভায়ের কী আনন্দ। মুনি বললেন, 'রাতে আমাদের খিদে ছিলনা। আমরা তাই আসিনি। এখন আহারের আয়োজন কর। আমরা আহার সেরে ফিরব।

এখন দ্রৌপদীর কোন ভাবনা নেই। তিনি সবাইকে খুব করে খাইয়ে দিলেন। মুনি খুশী হয়ে দশহাজার শিষ্য নিয়ে ফিরে গেলেন। দ্রৌপদী মনে মনে তখন সখাকে প্রণাম জানালেন।

নচিকেতার কথা

এক নাম করা মুনির নাম নচিকেতা। মুনির সব সময় ধর্মে কর্মে মন। বেদ পাঠে আর জপে-তপে তাঁর সব সময় কাটে। ছেলেও দিন দিন বাবার মত হয়ে উঠল। বাবার কাছে বেদ পুরাদের গল্প শোনে। সেসব শুনে শুনে জ্ঞান-বুদ্ধিও তার হোল খুব। খুব কম বয়সেই তার অনেক কিছু জানা হয়ে গেল। এসব দেখে তার বাবাও খুব খুশী।

মুনির বেশ বয়েস হয়েছে। কখন ওপরের ডাক পড়ে কে জানে! মন হোল, খুব বড় করে যজ্ঞ করবেন। যে বিশেষ যজ্ঞটি তিনি করবেন ঠিক করলেন, সেটি বড় কেউ করেনা। করেনা, তার কারণ আছে। ওই যজ্ঞের শেষে সব চাইতে প্রিয় জিনিসটিকেই দান করে দিতে হয়। তাই কেউ করতে চায়না ওই যজ্ঞটি। মুনি কিন্তু ওইটিই করবেন ঠিক করলেন।

মুনি যজ্ঞ করছেন। দান নেবার জন্য কত শত মুনিঋষি আসছেন। নচিকেতার বাবা সবাইকে অনুরোধ করছেন কিছু না কিন্তু দান নিতে। নচিকেতা প্রথম থেকেই বসে বসে দেখছে সব। সে জানে তার বাবা তাকেই সব চাইতে বেশী ভালবাসেন। সে বাবার সব চাইতে প্রিয়। নচিকেতা সব দেখছে আর মাঝে মাঝে বলে উঠছে, 'বাবা, আমাকে আপনি কার হাতে দান করবেন?' বাবা জবাব দিতে চাননা। কিন্তু বারবার একই কথা শুনে এক সময় বলে উঠলেন 'যমের হাতে।'

নচিকেতা ভীষণ খুশী। বাবা তাঁর প্রিয়বস্তু দান করেছেন। তাঁর যজ্ঞ সফল হবে। নচিকেতা মনের আনন্দে চলল যমের বাড়ী। নচিকেতা যখন পেঁছল যমের রাজ্যে, যম তখন ছিলেননা। সে যমের অপেক্ষায় বসে রইল। অন্যেরা অনুরোধ করল ছেলেটিকে খাওয়া-দাওয়া করতে। নচিকতা কিন্তু জল পর্যন্ত ছুঁলোনা। তিন-দিন ঠায় বসে রইল সে।

তিনদিন পরে যম ফিরলেন রাজ্যে। এসে দেখলেন নচিকেতাকে। শুনলেন এ তিনদিন না খেয়ে বসে আছে ওর জন্য। যম বুঝলেন, ছেলেটি সাধারণ নয়।

যম নচিকেতাকে বললেন, 'তোমার ওপর আমি খুব খুশী হয়েছি। তুমি তিনটি বর চাও আমার কাছে। তোমার মনোমত বর।' নচিকেতা বললে, 'প্রভু আপনি যদি সত্যিই খুশী হয়ে থাকেন তবে এমন বর দিন যেন বাবার মনে কোন দুঃখ না থাকে। তিনি যেন আগের মতই আমাকে স্নেহ করেন।' যম বললেন, 'তাই হবে'।

তারপর নচিকেতা বললে, 'প্রভু,এবার আপনি আগুন দেবতার কথা বলুন। তার কথা আমি কিছুই জানিনে। আমি সব কিছু জানতে চাই।

যম তাকে আগুন দেবতার কথা বুঝিয়ে বললেন। নচিকেতা খুব মন দিয়ে শুনল সব। বড় খুশী হল সে।

এবার নচিকেতা বললে, 'প্রভু, আপনি দু'টো বর দিয়েছেন। তৃতীয় বরে আপনি আমাকে জন্ম আর মৃত্যুর কথা বুঝিয়ে বলুন। জন্ম আর মৃত্যু কী, আমি সব জানতে চাই।'

যম বললেন, 'শোন নচিকেতা।' তুমি মৃত্যুর কথা জানতে চেওনা। ওকথা কারোর জানা চলবেনা। আমি তোমাকে জন্মের

অর্থ কী, তা বুঝিয়ে বলছি শোন। মৃত্যুর কথা জানতে চেওনা। তার চাইতে বরং ধনদৌলত চাও, রাজ্য চাও। যা চাইবে আমি তাই দোব তোমাকে।'

নচিকেতা কিন্তু জন্ম আর মৃত্যুর রহস্য জানতে চায়। সে রাজ্য, ধনদৌলত চায়না। সে তাই হাতজোড় করে বললে, 'প্রভু' সত্যিই যদি আপনি বর দিতে চান তাহলে ওই জ্ঞানই দিন। আমি জন্ম আর মৃত্যুর কথা সব জানতে চাই। মৃত্যুর কথাই বরং বেশী করে জানতে চাই।'

যম বড় আনন্দ পেলেন। জ্ঞানলাভ করবার এত ইচ্ছে বড় একটা দেখা যায়না। যমরাজা তাই ধীরে ধীরে সবকথা নচিকেতাকে বুঝিয়ে বললেন। মৃত্যুর রহস্যও বললেন তাকে। সব জেনে-শুনে নচিকেতা তার বাবার কাছে ফিরে গেল।

মৈত্রেয়ীর কথা

এক মুনির দুই স্ত্রী ছিলেন। একজনের নাম মৈত্রেয়ী আর অন্যজনের নাম কাত্যায়নী। মুনির খুব নাম। খুব জ্ঞানী লোক। তাঁর শিষ্য হয়ে আসেন কত লোক। মুনি কিন্তু সংসারে থাকেন। সংসারটিও বেশ বড়। মুনির একদিকে সংসার, অন্যদিকে জপতপ, ভগবানের নাম করা। সংসারের দিকে নজর রাখেন কাত্যায়নী। মুনির জপতপ আর পুজোপাঠের দিকে সাহায্য করেন। মুনির দিন কাটে বেশ আনন্দেই।

বয়স হলে সেকালে অনেকে সংসার থেকে চলে যেতেন বনে। সেখানে নিরিবিলিতে ভগবানের নাম করতেন। এ মুনিরও বেশ বয়স হয়েছে। তাই ইনিও স্থির করলেন বনে চলে যাবেন।

একদিন মুনি দুই স্ত্রীকে কাছে ডাকলেন। ডেকে বললেন, 'আমার বয়স হয়েছে। অনেক আগেই আমার উচিত ছিল সংসার ছেড়ে চলে যাওয়া! ভাবছি এবার চলে যাব। এখন বল, তোমাদের মত কী?'

কাত্যায়নী বললেন, 'আমরা আর কী বলব! আপনি যা ভালো বোঝেন করবেন। আপনি বলে যান কীভাবে সংসার চলবে। আমরা কীভাবে থাকব, সেই উপদেশ দিন।'

মুনি বললেন, 'তোমরা এখানে আমার সংসারে থাকবে। এখনকার মতই দু'বোন হয়ে থাকবে। আমার যা আছে তা আমি

সব ভাগ করে দোব দু'জনকে। এরপর আর কোন জিনিস নিয়ে তোমাদের মধ্যে বিবাদ হবেনা।'

মৈত্রেয়ী চুপ করে সব শুনছিলেন। মুনির কথায় তিনি একটু দুঃখ পেলেন। গরুবাছুর, গাছপালা নিয়ে ঝগড়া! আবার সে ঝগড়া কিনা বোন কাত্যায়নীর সঙ্গে। এসব মৈত্রেয়ী ভাবতেই পারেননা। মুনি এরকম কথা ভাবলেন কী করে? মৈত্রেয়ীর বেদপুরান পড়েই দিন কাটে। মুনির কাছে শিষ্যের মত বসে জ্ঞানের কথা শোনেন। তিনি ত সংসারের কথা ভাবেনইনা।

মৈত্রেয়ী চুপ করে আছেন। এবার মুনি তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'বল মৈত্রেয়ী, তোমার কী বলবার আছে?'

মৈত্রেয়ী ধীরে ধীরে বললেন, 'আমি একটি কথাই জানতে চাই। সংসারের কোন জিনিসটির সাহায্যে ভগবানকে পাওয়া যায় বলুন। আমি তাহলে সেই জিনিসটি আপনার কাছ থেকে চেয়ে নেব।

মুনি হেসে বললেন, 'না মৈত্রেয়ী কোন জিনিসের সাহায্যেই নয়। সংসারের কোন জিনিস দিয়ে ভগবানকে পাওয়া যায়না। ওতে মন দিলে বরং লোকে ভগবানকে ভুলেই যায়।'

'তাহলে এই সংসারের কোন জিনিসই আমি চাইনে'—বললেন মৈত্রেয়ী। 'আপনি বরং সেই পথের কথা বলুন, যে-পথে ভগবানকে পাওয়া যায়। আপনি বলুন কীভাবে ওই চিন্তার মধ্যে আমি দিনরাত ডুবে থাকতে পারি। এই জ্ঞান পেলে আমি ধন্য হবো। এই জ্ঞানের সাহায্যে আমি মৃত্যুকে জয় করতে পারব।'

মুনি মৈত্রেয়ীর কথা শুনে বড় আনন্দ পেলেন। এরপর মুনি এঁকে ভগবানকে পাওয়ার পথ কী তাই বোঝালেন যত্ন করে।

বন্ধুর কথা

কৃষ্ণ আর সুদামা। একজন ধনীর ছেলে আর একজন গরীবের। কিন্তু দু'জনের খুব ভাব। কৃষ্ণ মাঠে যান গরু নিয়ে, সুদামা যান সঙ্গে। সুদামা যান খেলা করতে, কৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে থাকেন। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। খুব ভালোবাসেন দু'জন দু'জনকে।

কৃষ্ণ আর একটু বড় হলেন। বড় হয়ে তিনি হলেন রাজা। দেশ জুড়ে তখন তাঁর নাম। সুদামা কিন্তু যে গরীব সে গরীবই রইলেন। কৃষ্ণের সুখের শেষ নেই। সুদামার দুঃখেরও শেষ নেই। কৃষ্ণ দু'হাতে টাকা পয়সা দান করেন। সুদামার যা আয় তা দিয়ে তার সংসার চলে না। ছেলে-মেয়েরা পেটভরে খেতেও পায়না। সুদামার সংসারে দিনরাত অভাব আর অভাব।

একদিন সুদামার স্ত্রী বললেন, 'তুমি তোমার বন্ধুর কাছে যাও। একদিন ত তিনি খুবই ভালোবাসতেন তোমাকে। আজ তিনি রাজা। সেই ভালোবাসা হয়ত আগের মতই আছে। হয়ত কিছু ধন-দৌলত তোমাকে দিয়ে দিতেও পারেন তিনি।'

সুদামা ভাবেন আর ভাবেন। যাওয়া কি ঠিক হবে? কৃষ্ণ যদি চিনতে না পারেন? যদি খালি হাতেই ফিরে আসতে হয়? তখন ত স্ত্রীর কাছে বন্ধুর দাম কমে যাবে। না, এ কিছুতেই হতে পারে না। বন্ধুকে ছোট করা যেতেই পারে না।

কিন্তু সুদামার কষ্ট বেড়েই চলে, সুদামার ছেলেমেয়েরা উপোস
করে থাকে। অনেক ভেবে মন ঠিক করে ফেললেন সুদামা।
বন্দুর কাছে যেতেই হবে তাঁকে।

সেদিন সুদামা কৃষ্ণের কাছে যাচ্ছেন। খালি হাতে বন্ধুর বাড়ী
যান কী করে ? স্ত্রী আধসেরটাক চিঁড়ে বেঁধে দিলেন সুদামার
কোঁচার খুঁটে। তাই নিয়ে রওনা হলেন সুদামা।

অনেক দেশ পেরিয়ে কৃষ্ণের কাছে পৌঁছলেন সুদামা। বিরাট
রাজবাড়ী। ঢাল-তলোয়ার নিয়ে সেনারা পাহারা দিচ্ছে। ওরা
দেখল ভিখিরীর মত দেখতে সুদামকে। ভিখিরীকে রাজবাড়ীতে
ঢুকতে দেবে কেন ? ওরা সুদামাকে ঢুকতেই দিলেন না। সুদামা
বসে রইল রাজবাড়ীর দরজায়।

যে করেই হোক কৃষ্ণ খবর পেলেন। জানতে পারলেন তাঁর
লোকজনেরা সুদামাকে রাজবাড়ীর মধ্যে ঢুকতে দেয়নি। তিনি
দৌড়ে এলেন রাজবাড়ীর দরজায়। সুদামা তখনো শুকনো মুখে
বসে আছেন। কাপড়ের খুঁটে বাঁধা চিঁড়ের পুঁটলী। কৃষ্ণ বন্ধুকে
বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কী আনন্দ দু'জনের। দু'জনের মুখে হাসি
আর ধরেনা। দু'জনের চোখেই কিন্তু জল।

খুব আদর করেই সুদামকে ভেতরে নিয়ে গেলেন কৃষ্ণ। চিঁড়ে
পেয়েও ভারি খুশী। এত ভালো জিনিস যেন এর আগে কোন
দিনই খাননি তিনি। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনে সুদামার অনেক
খাতির যত্ন করেন। দিনরাত দু'বন্ধু থাকেন একসাথে। কথা
যেন আর ফুরোয়না। পুরোনো দিনের কথা ওঠে। সে নিয়েও কত
হাসাহাসি। সুখ যেন ধরেনা আর।

দু'একবার সুদামা বাড়ীর কথা ভেবেছেন। স্ত্রী বলে দিয়েছিলেন

কৃষ্ণকে সংসারের দুঃখের কথা বলতে। ছেলে-মেয়েদের খাওয়া-পরার কষ্টের কথা বলতে। বন্ধু রাজা। একবার কথাটা কানে তুললেই হবে। তখন আর কোনো অভাব থাকবে না। কিন্তু সেসব কথা কি বলা যায় এখন? কেউ পারে বলতে? কতদিন পরে দেখা! কত আনন্দের কথা চলছে দিনরাত। তার মাঝখানে বাড়ীর কথা, অভাবের কথা কি বলা উচিত? কী ভাববেন কৃষ্ণ? তাঁর স্ত্রীইবা কী মনে করবেন? না, এ-কাজ সুদামা করতেই পারেন না। থাক্‌গে, এসব কথা কৃষ্ণকে জানিয়ে কাজ নেই।

বেশ কিছুদিন বন্ধুর কাছে কাটিয়ে বাড়ীর পথে রওনা হলেন সুদামা। কিন্তু নিজের বাড়ীর সামনে এসে অবাক। একী ঘটনা? তাঁর সেই ছোট্ট কুঁড়ে ঘর কই? তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বিরাট একখানা দালান। এমন সময় বাড়ীর বাইরে এলেন তাঁর স্ত্রী। এলো তাঁর ছেলেমেয়েরা সবাই। তাদের দেখেও সহজ নয়। ভালো ভালো জামাকাপড় পরা। গয়নাগাঁটি অনেক, সবাই ভীষণ খুশী।

সবকথা এক এক করে শুনলেন সুদামা। উনি যখন বন্ধুর কাছে, তাঁর লোকজনেরা এসে এসব করে দিয়ে গেছে। মুখ ফুটে কৃষ্ণকে কিছু বলার দরকারই হয়নি। সুদামার অভাব অনটনের কথা তিনি জেনেছেন। সেসব অভাব দূরও করে দিয়েছেন তিনি। বন্ধু কি বন্ধুর অভাব দেখতে পারে?
